অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ ৩য় পর্ব, ৪র্থ সংখ্যা ISSN 2222-5188

ইনফো

মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

- বিশেষ প্রবন্ধ
- ছবি দেখে রোগ নির্ণয়
- জরুরী চিকিৎসা
- রোগ ও জিজ্ঞাসা
- রোগ ও চিকিৎসা
- স্বাস্থ্যকথা

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৬
চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য	৭
জরুরী চিকিৎসা	৮
রোগ ও জিজ্ঞাসা	১০
রোগ ও চিকিৎসা	১১
স্বাস্থ্যকথা	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ মোঃ রাসেল রায়হান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

সর্বপ্রথম ইনফো মেডিকাস এর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আপনাদের সমর্থন ও সর্বাত্বক সহযোগিতার জন্য এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক এবং যুগপোযোগী সব তথ্যর মাধ্যমে আপনাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করাই এই চিকিৎসা সাময়িকীর উদ্দেশ্য।

ইবোলা ভাইরাস বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম জটিল এবং ভয়ংকর সংক্রামক ব্যাধি। তাই এই সংখ্যাটির বিশেষ প্রবন্ধে ইবোলা ভাইরাস সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে।

ফুড পয়জনিং কথাটির সাথে আমরা সবাই খুবই পরিচিত। আজকের বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আমাদের অনেক সময় বাহিরে খেতে হয়। এছাড়া বাসার খাবার অনেক সময় বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসব খাবার খেলে আমাদের হতে পারে ফুড পয়জনিং। তাই আমাদের জরুরী চিকিৎসা বিভাগে ফুড পয়জনিং ও এর থেকে পরিত্রাণের কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর এর সাথে থাকছে আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "বাচ্চাদের আকস্মিক বিষক্রিয়া"।

শিশুর কিডনি সমস্যা, মূত্রথলির প্রদাহ ও পিত্তপাথর রোগের সমস্যা এবং এই সমস্যাগুলোর সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে রোগ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে।

বরাবরের মত ছবি দেখে রোগ নির্ণয় বিভাগে এবারও কিছু নতুন ছবি সংযোজন করা হয়েছে, যা আপনাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

এই সংখ্যায় নতুন সংযোজন 'স্বাস্থ্যকথা' যার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে অ্যালঝেইমার্সের লক্ষণ।

সর্বশেষে এই সংখ্যাটির তথ্যগুলো আপনাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করছি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

ইবোলা ভাইরাসজনিত ব্যাধি

ইবোলা একটি সংক্রামক ভাইরাসজনিত ব্যাধি। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ব্যাধি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে বহু লোক মারা গেছেন ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। শুধু আফ্রিকাবাসীই নন, বিশ্বব্যাপী ইবোলা ভাইরাস আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অতীতেও পশ্চিম আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয়েছে; কিন্তু তা হয়েছিল সীমিত আকারে। ২০১৪ সালে এর আক্রমণ ঘটেছে বিশাল এলাকা জুড়ে। এরই মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ইবোলা ভাইরাসজনিত সংক্রমণকে সারা দুনিয়ার জন্যই জরুরী জনস্বাস্থ্য সমস্যা (Global Public Health Emergency) হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছে। বিগত চার দশকের মধ্যে এটা সবচেয়ে ব্যাপক, ভয়ংকর এবং জটিল সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব।

ইবোলার ইতিহাস

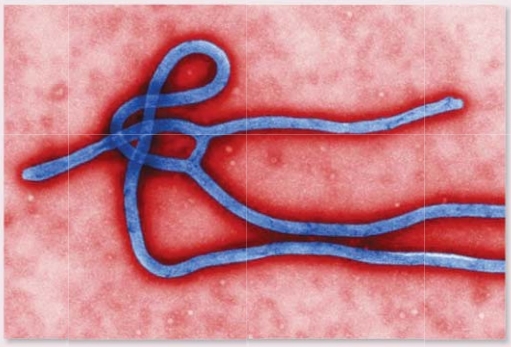

ইবোলা ভাইরাস পরিবারের নাম ফাইলোভিরিডি (Filoviridae)। ১৯৭৬ সালে এদের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর (স্বাধীনতার পূর্বে এর নাম ছিল জায়ার) উত্তরাঞ্চলের একটি নদীর নাম ইবোলা। এই নদীর অববাহিকায় ৬০ মাইল দক্ষিণে ইয়াম্বুকু নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। সেই গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাবালো লোকেলা ১৯৭৬ সালের ২৬ আগস্ট এক আজব রোগে আক্রান্ত হন। লোকেলা এই রোগের কারণে ৮ সেপ্টেম্বর মারা যান। তার মৃতদেহ সৎকারে অংশগ্রহণ করেন তার মা, স্ত্রী এবং বোনসহ আরও কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলা। কয়েকদিনের মধ্যেই তারাও সকলে একই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ইয়াম্বুকুর যে হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ওই হাসপাতালের ১৭ জন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে ১১ জনই একই রোগে মারা যায়। একই সময়ে সুদানের একটি এলাকাতেও একই রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। পরবর্তীতে অনেক অনুসন্ধানের পরে রোগটির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং ইবোলা নদীর নামানুসারে সেই রোগটির নাম দেওয়া হয় "ইবোলা ভাইরাসজনিত রক্তক্ষরা ব্যাধি" (Ebola Haemorrhagic Fever)। এখন এটাকে "ইবোলা ভাইরাসজনিত ব্যাধি" (Ebola Virus Disease) বলা হয়। এ পর্যন্ত এদের ৫ টি সাব-টাইপ পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

- Bundibugyo Ebolavirus (BDBV)
- Reston Ebolavirus (RESTV)
- Sudan Ebolavirus (SUDV)
- Taï Forest Ebolavirus (TAFV)
- Zaire Ebolavirus (EBOV)

এদের মধ্যে ৪ টি সাব-টাইপ মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। রেস্টন (Reston) সাব-টাইপ শুধুমাত্র বানর-শিম্পাঞ্জীদের শরীরে আক্রমণ করে। তবে ফিলিপাইন এবং চীনে এদের উপস্থিতির কথা জানা গিয়েছে। জায়ার (Zaire) সাব-টাইপ সবচেয়ে ভয়ংকর। ফল খাওয়া বাদুর বা ফ্রুট ব্যাটের গলায় এরা প্রাকৃতিকভাবেই অবস্থান করে। অর্থাৎ ফ্রুট ব্যাট এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক আধার এবং বাহক। তবে সজারু, শিম্পাঞ্জী-বানর এবং বন্য অ্যান্টিলোপের শরীরেও ইবোলা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীতে শুধু ইবোলা ভাইরাসই রক্তক্ষরা জ্বরের কারণ নয়। আরও অনেক ভাইরাস দিয়ে এমন জ্বর হয়। যেমনঃ আমাদের দেশে এখন অতি পরিচিত ডেঙ্গু জ্বর, মারবার্গ (Marburg) রক্তক্ষরা জ্বর, পীত জ্বর (Yellow Fever), লাসা জ্বর (Lassa Fever) ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে ইবোলার আক্রমণই এখন সবচেয়ে ভয়ংকর।

মানুষের শরীরে ইবোলা ভাইরাস প্রবেশ করার পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ২ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। অর্থাৎ এর সুপ্তিকাল সর্বাধিক তিন সপ্তাহ। এটি একটি বিপদের বিষয়। কারণ একজন মানুষের শরীরে ইবোলা ভাইরাস ঢোকার পরে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি সুস্থ মানুষের মতো বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন এবং তার সংস্পর্শে এসে নিজের অজান্তে আরও অসংখ্য মানুষ এর দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। অবশ্য ভাইরাস শরীরে ঢোকার ১-২ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত ব্যক্তি অসুস্থতার লক্ষণ বুঝতে পারেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৮-৯ দিনের মধ্যেই রোগ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

কিভাবে ছড়ায়

বলা হয়ে থাকে বাদুরের খাওয়া ফল থেকেই ইবোলা ভাইরাস মানুষের দেহে প্রথম প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে শুরু করে। ইবোলা আক্রান্ত মানুষের দেহরস অপর কোনো মানুষের দেহের স্পর্শে আসলে সেই ব্যক্তিও আক্রান্ত হতে পারেন। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরও ভাইরাসটি বেশ কয়েকদিন টিকে থাকে। আশার কথা হলো, রোগটি ফ্লু ও অন্যান্য বায়ুবাহিত রোগের মতো ছড়ায় না, আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে না আসলে এই রোগে সংক্রমিত হবার ভয় নেই।

আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, প্রস্রাব, মল, বীর্য ও অন্যান্য শারীরিক তরলের সংস্পর্শে ভাইরাসটি অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। প্রভাব দেখা যায় ২ থেকে ২১ দিনে

↓

রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা ও শ্বেত রক্তকণিকা ধ্বংস করে

↓

আক্রান্ত কোষগুলো সারা শরীরে ভাইরাসটি ছড়িয়ে দেয়

↓

রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এমন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছায় যে সেটি নিজের বিরুদ্ধেই কাজ করতে থাকে

↓

রক্ত জমাট করে ফেলে এবং এ কারণে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যায়

↓

রোগটি মানুষের মস্তিষ্ক, যকৃৎ, কিডনি, অন্ত্র, চোখ, যৌনাঙ্গসহ শরীরের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গে আক্রমণ করতে পারে

↓

সার্বিক রক্ত সংবহনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। শরীরের ভেতরে ও বাইরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। অঙ্গ বিকল হয়ে গিয়ে অথবা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে হৃৎপিণ্ড অকার্যকর হয়ে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে

ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ

- সহসা অত্যন্ত তীব্র জ্বর হয়; তাপমাত্রা ১০৩ ডিগ্রী থেকে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে যেতে পারে।
- অতিরিক্ত দুর্বল বোধ হয়; মাংসপেশীতে ব্যথা, গলায় ব্যথা এবং মাথা ব্যথা থাকে।
- ওপরের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিন পরে প্রচন্ড বমি এবং ডায়রিয়া হয়।
- সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ হচ্ছে ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণের ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রক্তের প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায় এবং রোগীর নাক, গলা এবং অন্যান্য স্থান দিয়ে রক্তক্ষরণের প্রবণতা দেখা যায়। অচিরেই ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে কিডনি বিকল হয়ে যায়। এর সঙ্গে অন্যান্য আরও অঙ্গ (যেমন ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদি) বিকল হয়ে যেতে পারে। রক্ত ক্ষরণ এবং পানি শূন্যতার পাশাপাশি রক্তনালীর বিশাল নেটওয়ার্কজুড়ে রক্ত জমে যাওয়ার ফলে এই বিপত্তি ঘটে। এই পরিস্থিতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Disseminated Intravascular Coagulation বা DIC বলা হয়।
- যে সকল রোগী দ্রুত খারাপ পরিণতির দিকে যায় তারা সাধারণত ৮ থেকে ৯ দিনের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। আর যারা ২ সপ্তাহ পর্যন্ত এর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারে, তারা সাধারণত বেঁচে যায়।

কেন এত আতঙ্ক?

অতীতে ইবোলার আক্রমণে প্রতি ১০ জনে ৯ জনই মারা গিয়েছে। বর্তমানে মৃত্যুর হার কমেছে। গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়ায় ৮ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত ইবোলা আক্রান্ত ১৭৭৯ জনের মধ্যে ৯৬১ জন মৃত্যু বরণ করেছেন। মৃত্যু হার প্রায় ৫৪%।

ইবোলা সংক্রমণ শনাক্ত করা কঠিন কেন?

সমস্যা হচ্ছে ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে যে সকল লক্ষণ-উপসর্গ দেখা যায় তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত অনেক রোগের মিল রয়েছে। আরও অনেক ভাইরাসজনিত ব্যাধি, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, এমন কি মেনিনজাইটিসের লক্ষণ-উপসর্গ থেকে ইবোলা

সংক্রমণকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা খুবই দুরুহ। মূলত রোগ শুরু হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিন পরে কিংবা আরও পরে শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ এবং ত্বকে রক্তক্ষরণজনিত ফোসার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর পরে অবশ্য ইবোলা নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু ততক্ষণে আসলে অনেক দেরী হয়ে যায়।

ইবোলা অত্যন্ত ছোঁয়াচে ভাইরাস। কিন্তু এটা হাম কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো বাতাসে ছড়ায় না, কলেরা-টাইফয়েডের মতো খাবার কিংবা পানির মাধ্যমে ছড়ায় না কিংবা হাঁচি কাশির মাধ্যমে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে না। মূলত এই ভাইরাস সরাসরি শরীরের নিঃসরণ যেমন- বমি, মল এবং রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগীর মুখের লালা, ঘাম এবং চোখের পানির মাধ্যমেও ছড়ায়। এ ছাড়া রোগীর নিঃসরণ সুস্থ মানুষের ত্বকের ক্ষত স্থানে লাগলেও ভাইরাস শরীরে ঢুকতে পারে। মনে রাখতে হবে ইবোলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগীর শরীরের নিঃসরণের মাধ্যমেই এটা সুস্থ মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। এ জন্য ইবোলা আক্রান্তদের সেবাদানকারী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং যত্নকারীরা বেশী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ইবোলার কারণে মৃত রোগীদের দেহ সৎকার করতে গিয়ে পরিবারের নিকটজনেরাও এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। একই ভাবে ইবোলা ভাইরাস আক্রান্ত বাদুর কিংবা অন্য প্রাণী মাংস খেয়েও অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন। ইবোলা আক্রান্ত রোগীর মুখের লালা, ঘাম এবং চোখের পানির চেয়ে বমি, মল এবং রক্তে ভাইরাসের পরিমাণ বেশী থাকে। অসুস্থতা শুরু হওয়ার ২ মাস পরেও আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে ইবোলা ভাইরাস শনাক্ত করা গিয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার ৭ সপ্তাহ পরেও বীর্যের সঙ্গে এই ভাইরাস নিঃসৃত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

রক্তে শ্বেতকনিকা ও অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেট কমে যায় এবং লিভার এনজাইম বেড়ে যায়। এই ইবোলা ভাইরাস ব্যাধিকে মূলত ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, সিগেলোসিস, কলেরা, লেপ্টোস্পাইরোসিস, প্লেগ, রিকেটসিয়া, মেনিনজাইটিস, হেপাটাইটিস ও অন্যান্য রক্তক্ষরনকারী ভাইরাসজনিত রোগ থেকে আলাদা করা জরুরী এবং সেইক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমুহ দ্বারা ইবোলা ভাইরাসজনিত ব্যাধি কে আলাদা করা যায়-

- Antibody-Capture Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
- Antigen detection tests
- Serum neutralization test
- Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) assay
- Electron microscopy
- Virus isolation by cell culture

চিকিৎসা

এখন পর্যন্ত অন্যান্য আরও অনেক ভাইরাসজনিত রোগের মতো ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। মূলত রোগীকে সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গ উপশম করার জন্য চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়; যেমনঃ স্যালাইন, রক্ত পরিসঞ্চালন, প্লাটিলেট ট্রান্সফিউসন ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই রোগের লক্ষণগুলো অন্য আরও অনেকগুলো রোগের লক্ষণের সাথে মিলে যায়। ফলে রোগ শনাক্ত করতে সময় লেগে যায়। তাই সঠিক রোগ শনাক্ত করা এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়াটাও অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তবে যদি রোগ দ্রুত সময়ের মধ্যে শনাক্ত করা যায় এবং সঠিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া যায় তাহলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

ইবোলার বিরুদ্ধে এখনও কোন কার্যকরী টীকা আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এবছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে একটি ভ্যাক্সিন পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভ্যাক্সিনটি মার্কিন জাতীয় অ্যালার্জি এবং সংক্রামক ব্যাধি সংস্থা (NIAID) আবিষ্কার করেছে। বাহক হিসেবে শিম্পাঞ্জীর শরীরে থাকা অ্যাডেনো ভাইরাসের ভিতরে ইবোলা ভাইরাসের দুটি জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এটাকেই ভ্যাক্সিন হিসেবে মানুষের শরীরে দেওয়া হবে। আশা করা হচ্ছে এর ফলে ভ্যাক্সিন গ্রহণকারীর শরীরে ইবোলা ভাইরাসের বিরুদ্ধেও ইমিউনিটি তৈরি হবে। বানর এবং শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রে এই ভ্যাক্সিনের ট্রায়াল সফল প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে কি হয় তা আমরা হয়তো অচিরেই জানতে পারবো। আর একটি অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কেউ ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণের পরে বেঁচে গেলে তার রক্তে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এজন্য এদের রক্ত অথবা রক্তরস সংগ্রহ করে তা অন্য কোন আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করালে উক্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। আফ্রিকায় আক্রান্ত অনেকের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য এখনও এর ফলাফল কোন জার্নালে প্রকাশ করা হয়নি।

BCX4430 নামে একটি পরীক্ষামূলক ওষুধের কথা এ বছর এপ্রিল সংখ্যার ন্যাচার (Nature) পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। বানর প্রজাতির প্রাণির শরীরে BCX4430 সফল প্রমাণিত হয়েছে। BCX4430 আরএনএ-নির্ভর আরএনএ পলিমারেজ ইনহিবিটর (RNA-Dependent RNA Polymerase Inhibitor)। কিন্তু কোন মানুষের শরীরে এটা এখনও ব্যবহার করা হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় ইবোলা সংক্রমণ প্রতিরোধযোগ্য একটি ব্যাধি। এজন্য আক্রান্ত দেশসহ অন্যান্য সকল দেশের সমন্বিত প্রয়াস জরুরী। এ সম্পর্কে সকলের সচেতনতা খুবই প্রয়োজনীয়।

তথ্যসূত্রঃ World Health Organization (WHO)

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

ক্রনিক ভেনাস স্ট্যাসিস

টিউবারকুলোসিস

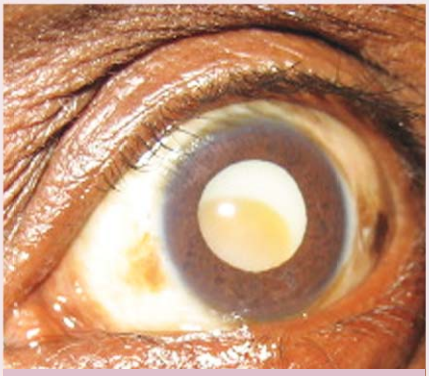

রেটিনোব্লাস্টোমা

টোরাস ম্যান্ডিবুলারিস

লিউকোসাইটোক্লাস্টিক ভাসকুলাইটিস

ওরাল থ্র্যাস

ফলিকুলাইটিস

ইরাইসিপিলাস

হাইপারহাইড্রোসিস

হেমানজিওমা

ইকথাইয়মা

ফেসিয়াল সেলুলাইটিস

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

বেশিদিন বাঁচতে চাইলে, দৌড়ান

প্রতিদিন দৌড়ান অল্প কয়েক মিনিট হলেও। বেশিদিন বাঁচতে দৌড় কাজে আসে। হৃদরোগে মারা যাওয়ার ঝুঁকি থেকেও বাঁচিয়ে দিতে পারে নিয়মিত দৌড়ানোর অভ্যাস। সম্প্রতি মার্কিন গবেষকেরা তাঁদের এক গবেষণায় এ তথ্য পেয়েছেন।

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেন, নিয়মিত শারীরিক কসরতের ক্ষেত্রে সময় এখন আমাদের বড় একটি বাধা বলে মনে করা হয়। এই গবেষণা মানুষকে দৌড়ানোর জন্য উৎসাহ দেবে। বেশিদিন বাঁচার লক্ষ্যে দৌড়ানো শুরু করে ও তা ধরে রাখতে উৎসাহ মিলবে। এই গবেষণার জন্য ১৮ থেকে ১০০ বছর বয়সী ৫৫ হাজার ১৩৭ জন ব্যক্তিকে নিয়ে গত ১৫ বছর ধরে গবেষণা করেছেন তাঁরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দৌড়ানো ও দীর্ঘায়ুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা বের করতে দীর্ঘদিন ধরে এ গবেষণা চালিয়ে আসছেন গবেষকেরা। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা ৫১ মিনিটের কম, ছয় মাইলের বেশি, ঘণ্টায় ছয় মাইলের কম গতিতে ও সপ্তাহে দু-একবার দৌড়ান তাঁরা যারা মোটেও দৌড়ান না তাদের চেয়ে কম মৃত্যু-ঝুঁকিতে থাকেন। গবেষণায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ২৪ শতাংশ দৌড়কে তাদের অবসর সময়ের ব্যায়াম হিসেবে নিয়েছিলেন।

গবেষকেরা বলেন, যাঁরা সপ্তাহে এক ঘণ্টারও কম দৌড়ান তাঁরাও যাঁরা সপ্তাহে তিন ঘণ্টার বেশি দৌড়ান তাদের সমান দীর্ঘায়ু সুবিধা পেতে পারেন। দীর্ঘায়ু লাভের জন্য বেশি দৌড়ালে বেশি সুবিধা এ ধারণা ঠিক নয়। টানা ছয় বছর ধরে গড়পড়তা দৌড়ের অভ্যাস থাকলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়া যায়। হৃদরোগ ও স্ট্রোকের মৃত্যু ঝুঁকি ৫০ শতাংশ কমে। যাঁরা দৌড়ান না তাঁদের তুলনায় যাঁরা নিয়মিত দৌড়ান তাঁরা গড়ে তিন বছর বেশি বাঁচেন। কত বেশি, কত দূর, নিয়মিত নাকি অনিয়মিত, কত দ্রুত এসব বিবেচনায় না নিয়ে দৌড়ালেই এ সুবিধা মিলবে বলে তাঁরা দাবি করেন। নারী-পুরুষ, কম বয়সী-বেশি বয়সী, ওজন বেশি-কম, ধূমপায়ী-অধূমপায়ী সকলেই এ সুবিধা পাবেন। গবেষণা প্রসঙ্গে গবেষকরা বলেছেন, দৌড়াতে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টি ধূমপান প্রতিরোধ, স্থূলতা ও উচ্চরক্তচাপ প্রতিরোধের প্রচারণার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

জন্মবিরতিকরণ পিল খাওয়ার পরও যে চারটি কারণে গর্ভধারণ হতে পারে

অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এড়াতে অধিকাংশ নারী জন্মবিরতিকরণ পিল ব্যবহার করেন। দাবি করা হয়, এসব পিল ৯৯.৭ শতাংশ নারীকে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ থেকে বাঁচায়। তবে পরীক্ষাগারের গবেষণায় কিন্তু এসব পিলের যথেষ্ট ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা গেছে, গর্ভনিরোধে এসব পিলের ব্যর্থতা ৯ শতাংশ। কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় পিলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সবমিলিয়ে চারটি বিষয় বের করা হয়েছে যার ফলে জন্মবিরতিকরণ পিল কোনো কাজ করে না।

নিয়মিত না খাওয়াঃ নিয়মমতো পিল না খেলে এটি কাজ করবে না। অন্যান্য হরমোন কন্ট্রাসেপ্টিভের মতোই এসব পিল নারী দেহের সংশ্লিষ্ট হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ পিল ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টিন হরমোনের সমন্বয়ে কাজ করে। পিল নিয়মিত না খেলে এসব হরমোনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে নারীর ডিম্বাশয় আগের মতোই উর্বর হয়ে ওঠে।

সময়মতো পিল না খাওয়াঃ বিজ্ঞানীরা ওরাল হরমোন ডোজকে নিরাপদ করতে গবেষণা চালিয়েছেন। প্রোজেস্টরেন-ইস্ট্রোজেন পিলের কার্যকারিতা পেতে হলে ৬ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। প্রোজেস্টরেন পিল ব্যবহার করতে হবে প্রতিদিনের ভিত্তিতে। একদিন বাদ পড়লে দেহে হরমোনের মাত্রা কমে যেতে পারে।

বিশেষ চিকিৎসা অবস্থায়ঃ কিছু বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য এসব পিল কাজ করে না। যেমন-টিউবারকুলোসিসের জন্য রিফাডিন চিকিৎসা, গ্রিসেওফালভিনের জন্য অ্যান্টি-ফাংগাল ড্রাগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পিল কার্যকারিতা দেখাতে পারে না। তাই চিকিৎসকদের এসব ওষুধ নেওয়ার ক্ষেত্রে পিলের বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে।

হার্বাল সাপ্লিমেন্টঃ যেকোনো হার্বাল সাপ্লিমেন্টের কারণে গর্ভনিরোধক পিলের কার্যকারিতা নষ্ট হতে পারে। এ জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ ওষুধ ও হার্বাল সাপ্লিমেন্টের কারণে গর্ভনিরোধনে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ফুড পয়জনিং

পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় আমাদের খাবার ঠিকঠাক থাকে না। আর খাবারের অনিয়ম মানেই পেটের সমস্যা। ছোটখাট পেটের সমস্যায় দু-একটা ঔষধ খেলেই সেরে যায়। কিন্তু যদি অসুখের নাম ফুড পয়জনিং হয় তাহলে এত সহজে ভালো হয় না। এমনকি বিষয়টি ৪৮ ঘন্টার বেশি যদি থাকে তাহলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা যায়। তাই ফুড পয়জনিং থেকে সাবধানে থাকতে হবে। তবে কিছু বিষয় এড়িয়ে চললে ফুড পয়জনিং এর সমাধান সহজেই করা যায়।

ফুড পয়জনিং হলে যা যা করণীয়

- এই ধরনের সমস্যা হলেই প্রথমেই ২-৩ ঘন্টা পানি এবং কোন ধরনের খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে।
- ২ থেকে ৩ ঘন্টা পর সোডা জাতীয় কিছু পানীয় পান করতে হবে। তবে সাধারণত যেভাবে এই জাতীয় পানীয় পান করা হয় তার থেকে অন্যভাবে পান করতে হবে এই সময়। প্রথমে এই পানীয়তে ১-২টি বরফ দিতে হবে এবং প্রতিটি সিপে অল্প পরিমাণে সোডা খেতে হবে। একসঙ্গে বেশি মাত্রায় পানীয় খেলে সমস্যা কমার বদলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- অনেকক্ষন না খেয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই খিদে পেতে পারে। এইসময় খিদে পেলে হালকা এবং তরল জাতীয় খাদ্য খেতে হবে অর্থাৎ স্যুপ, যব জাতীয় হালকা কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাদ্য এই সময়ের জন্য আদর্শ।
- যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থতা বোধ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দুগ্ধজাতীয় খাদ্য একদম খাওয়া যাবে না। দুগ্ধজাতীয় খাদ্য এই সময় খেলে অ্যাসিডিটি হয়ে ফুড পয়জনিং সাংঘাতিক রূপ নিতে পারে।
- এই সময়ে কোন ধরণের পেইন কিলার বা ঐ জাতীয় ওষুধ একেবারেই খাওয়া যাবে না। পেইন কিলার জাতীয় ওষুধ খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের দেহে। অনেকেই মনে করেন বাইরের কেনা খাবার থেকে এই অসুখটি হয়, এই ধারনা ভ্রান্ত। বাড়িতে রান্না করা খাবারের মধ্যে থেকে ফুড পয়জনিং হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা থাকে। তাই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে যাতে বাড়ীর খাবার থেকে কোনভাবেই ফুড পয়জনিং না হয়। মাঝেমধ্যেই নিজেদের রান্নাঘর, বাসনপত্র ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। বাসনের ময়লা থেকে অনেক সময় এই অসুখটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খেতে বসার আগে অবশ্যই সাবান বা লিক্যুইড সোপ দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে।
- বাজার থেকে সবজি বা ফল কিনে আনার পর সেগুলি ভালভাবে ধুয়ে ১-২ ঘন্টার মধ্যে সযত্নে প্যাকেটে মুড়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিতে হবে। যত বেশি সময় কাঁচা সবজি বাইরে থাকবে সবজি খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যায়।
- কাঁচা সবজি বা খাবারের থেকে রান্না করা খাবার নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে। কারণ কাঁচা খাবার থেকে জীবাণু রান্না করা খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাবারটি নষ্ট করে দিতে পারে।
- রান্না করার সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাবার তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত গরম তাপে রান্না করা বা অত্যধিকবার খাদ্য ফোটানো একদিকে যেমন খাদ্যগুন কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে খাদ্যটি নষ্ট করে দিতে পারে যা থেকে ফুড পয়জনিং হওয়ার সবথেকে বেশি সম্ভাবনা থাকে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

আকস্মিক বিষক্রিয়া

বাচ্চা কী ধরণের, কতটুকু পরিমাণ বিষাক্ত বস্তু খেয়ে ফেলেছে এর ওপর নির্ভর করে উপসর্গ দেখা দেয়। কিছু বিষাক্ত বস্তু আছে, যা খাওয়ার পর কিছু নগণ্য উপসর্গ দেখা দেয়। অন্যদিকে কিছু বিষাক্ত বস্তু খাওয়ার পর বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, ঝিমুনি, মুখ ও খাদ্যনালি জ্বালাপোড়াসহ বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কিছু বিষ আছে, যেগুলো খুবই মারাত্মক এবং অল্প পরিমাণই ভয়ংকর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন- খিঁচুনি, হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া; এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। বাসাবাড়িতে মাঝেমধ্যে বড়রা কোনো কাজ করার সময় ভুলে বিভিন্ন জিনিস বাচ্চাদের নাগালে রেখে দেয়। তা দিয়ে আকস্মিক

বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। মাঝেমধ্যে বাচ্চারা উঁচু শেল্ফে রাখা জিনিসপত্রের প্রতিও কৌতূহল হয় এবং তা নাগালে পাওয়ার চেষ্টা করে, যা দিয়ে বিষক্রিয়া হতে পারে।

আকস্মিক বিষক্রিয়া বা অ্যাকসিডেন্টাল পয়জনিংয়ের শিকার বাচ্চারাই বেশি হয়। বাচ্চারা খুব কৌতূহলী হয় এবং নতুন কোনো জিনিস পেলেই তা মুখে দিতে চায়। কিন্তু জিনিসটি ক্ষতিকর কি না তা বুঝতে পারে না। বড়রা টক বা তিতা স্বাদ থেকে বিষ এবং খাদ্যবস্তুর পার্থক্য ধরতে পারে। কিন্তু শিশুরা সেটা বুঝতে পারে না। আবার অনেক শিশু ট্যাবলেট ও ক্যাপসুলকে চকলেট মনে করে। মূলত বাচ্চাদের বিষক্রিয়া হয় যাদের বয়স তিন বছরের নিচে। এই বয়সের বাচ্চারা খুবই কৌতূহলী হয় এবং তারা নিরাপদ কিংবা বিপদজনক বস্তুর তফাৎ ধরতে পারে না।

একটি বাসায় সচরাচর বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যেমন- জ্বরের ওষুধ, ঠান্ডাকাশির ওষুধ, মাউথ ওয়াশ, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক, ঘুমের ওষুধ বা হৃদরোগের ওষুধ থেকে থাকে। আরও থাকে বিভিন্ন ধরনের সাবান, ডিটারজেন্ট, ব্লিচিং পাউডার, ডিশ ওয়াশিং পাউডার ইত্যাদি। প্রসাধনীর মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের ক্রিম, লোশন, শ্যাম্পু, সুগন্ধি, আফটার শেভ ইত্যাদি। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে থাকে কেরোসিন, সিগারেট, আঠা, ব্যাটারি, কীটনাশক ইত্যাদি। ন্যাপথলিন প্রতিটি বাড়িতেই রাখা হয়, যা আকস্মিক বিষক্রিয়ার অন্যতম কারণ।

রক্ত পরীক্ষা

রক্তে বিষের পরিমাণ মাপতে হবে এবং তা পরবর্তী চিকিৎসা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

চিকিৎসা

বিষক্রিয়ার ধরণের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা দেওয়া হয়।

অ্যাকটিভেটেড চারকোলঃ এটি বিষকে পরিশোষণ করে শরীরে বিষের শোষণকে বাধা প্রদান করে এবং মলের সঙ্গে শরীর থেকে বিষ বের করে দেয়। কিন্তু এটি বিষ খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়াতে হবে। তাই বাসায় সব সময় কিছু অ্যাকটিভেটেড চারকোল রাখা জরুরি। বাজারে আলট্রাকার্বন নামে জার্মানের তৈরি অ্যাকটিভেটেড চারকোল পাওয়া যায়।

আলট্রাকার্বনের সেবনবিধি - বিষক্রিয়ার জন্য কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই ৫০টি ট্যাবলেট গুলিয়ে পেস্ট বানাতে হবে এবং সেটি রোগীকে খাওয়াতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে। পেস্টিসাইড বা কীটনাশকজনিত বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে আলট্রাকার্বন সেবন করা যাবে না।

পর্যবেক্ষণ

কিছু বিষ আছে, যা একটু দেরি করে ক্রিয়া শুরু করে। তাই রোগীকে হাসপাতালে সম্ভব হলে দিনরাত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া, রক্তচাপ ইত্যাদি সব সময় নজরে রাখতে হবে।

প্রতিবিষ বা অ্যান্টিডট

এই প্রতিবিষগুলো বিষের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অ্যাকটিভেটেড চারকোলও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিরোধ

- বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই বেশি কার্যকর। কিছু সাধারণ পদক্ষেপ একটি বাচ্চাকে বিষাক্ত বস্তু থেকে দূরে রাখতে পারে।
- যাবতীয় ওষুধ, কীটনাশক, বাগান করার সামগ্রী ও রাসায়নিক দ্রব্য সব সময় বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হয়।
- যাবতীয় আলমারি, শেল্ফ ইত্যাদিতে অবশ্যই তালা ব্যবহার করতে হবে।
- বাচ্চাদের ওষুধ খাওয়ানোর আগে অবশ্যই মোড়কের গায়ে নাম ও ব্যবহার-প্রণালী দেখে নিতে হবে।
- ওষুধ খাওয়ার সময় বাচ্চাদের আড়ালে খেতে হবে, যাতে তারা ওষুধ খাওয়া দেখে কৌতূহলী বা উৎসাহিত না হয়।
- মায়েদের অবশ্যই হাতের ব্যাগ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। বাতিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি, বিষ, ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য সঠিক জায়গায় ফেলে দিতে হবে।
- বিষ ও ওষুধগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট মোড়কে বা বোতলে রাখতে হবে।
- বাড়িতে অবশ্যই বিষাক্ত গাছপালা রাখা যাবে না। মা-বাবাদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত এবং একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স বাড়িতে রাখা উচিত। সেটিতে আলট্রাকার্বন রাখতে হবে।

আকস্মিক বিষক্রিয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হলে সতর্ক থাকাটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের উপায় কি ?

উত্তরঃ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও শারীরিক পরিশ্রম করে আমরা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে। খোসাসহ সবজি খাওয়া ভালো। খাদ্যতালিকা থেকে প্রাণিজ চর্বি বাদ দিতে হবে, যেমন- খাসির মাংস, গরুর মাংস, মুরগির চামড়া, কলিজা, মগজ, মাছের ডিম, ডিমের কুসুম, চিংড়ি মাছ প্রভৃতি। রান্নায় কম তেল দিতে হবে। তেলে ভাজা খাবার কম খেতে হবে। ঘি, মাখন, পনির, মেয়নেজ খাওয়ার অভ্যাস বাদ দিতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ মিনিট করে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন জোরে জোরে হাঁটতে হবে। কাছাকাছি জায়গায় রিকশা না নিয়ে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস করা যেতে পারে। ধূমপান ছেড়ে দিতে হবে। ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জীবনযাত্রার অভ্যাস পরিবর্তনের দু-তিন মাস পরও যদি রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে ওষুধ খেয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধী টিকা কাদের দেওয়া উচিত?

উত্তরঃ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস জরায়ুমুখ ক্যানসারের জন্য দায়ী। এই ভাইরাসের বিপরীতে প্রতিষেধক টিকা বর্তমানে সব মেয়েকে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এই টিকা অবিবাহিতা অর্থাৎ ৯ থেকে ২৫ বছর বয়সী মেয়েদেরই দেওয়া উচিত। প্রথম টিকার এক মাস পর একটি এবং ছয় মাস পর দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ নিতে হয়। তবে বলা হয়, প্রতিষেধকক্ষমতা মোটামুটি পাঁচ-ছয় বছর থাকে। তাই টিকা দিলে কখনো ক্যানসার হবে না, তা নিশ্চিত নয়।

মোটা ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন কথাটা কি ঠিক?

উত্তরঃ স্থূল বা ক্ষীণ যেকোনো মানুষেরই উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। তবে ওজন বৃদ্ধি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও হৃদ রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই স্থূল ব্যক্তিদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এ ছাড়া পারিবারিক ইতিহাস, আনুষঙ্গিক ডায়াবেটিস, কিডনি জটিলতা ও অন্যান্য রোগ, মানসিক চাপ ইত্যাদিও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে থাকে।

কিডনি রোগীরা কি খেতে পারবে এবং কি খেতে পারবে না?

উত্তরঃ পানি খেতে হবে পরিমিত। প্রতিদিনের প্রস্রাবের পরিমানের ওপর নির্ভর করবে কতটুকু পানি রোগী খেতে পারবেন। কিডনি রোগী মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ আমিষ সীমিত পরিমাণে খাবেন। উদ্ভিজ প্রোটিন বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন যেমন-ডাল, মটরশুটি, সিমেরবীচি যে কোন বীচি ডায়েট চার্টে থাকবে না। যে সমস্ত- সবজি খাবেন না: ফুলকপি, বাধাকপি, গাজর, ঢেঁড়শ, শিম, বরবটি, কাঠালের বীচি, শীমের বীচি, মিষ্টি কুমড়ার বীচি, কচু, মূলা এবং পালং, পুঁইশাক ইত্যাদি। ফলের ক্ষেত্রেও আছে নানান রকম নিষেধাজ্ঞা। প্রায় সব ফলেই সোডিয়াম পটাশিয়ামের আধিক্য আছে বলে কিডনি রোগীদের জন্য ফল খাওয়া একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বিশেষ করে আঙ্গুর, কলা, ডাবের পানি। অল্প পরিমাণে আপেল এবং পেয়ারা তুলনামূলক নিরাপদ।

হঠাৎ নাক দিয়ে রক্ত পরলে কি করনীয় ?

উত্তরঃ হঠাৎ করে নাক থেকে রক্ত পড়তে শুরু করলে ঘাবড়ে না গিয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে ও দুই আঙুল দিয়ে নাকটা একটু চাপ দিয়ে ধরে টেনে রাখতে হবে। নাকের ওপরের দিকে যে শক্ত হাড় আছে, তার ঠিক নিচেই রয়েছে নরম তরুণাস্থি। ঠিক এ জায়গাটাতেই জোরে চেপে ধরতে হবে। এভাবে ৫ থেকে ১৫ মিনিট ধরে রাখতে হবে। এ সময় নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়াটা বন্ধ রাখতে হবে এবং মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হবে। নাকের ওপর একটু বরফ দিয়েও সেঁক দেয়া যেতে পারে।

প্রসূতি মায়ের বুক জ্বালাপোড়া করলে কি করনীয় ?

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় রক্তে প্রচুর প্রোজেস্টেরন হরমোন পরিপাকতন্ত্রের পেশির চলন ধীর করে দেয়, একই সঙ্গে খাদ্যনালির ভাল্ব নমনীয়তাকেও বিনষ্ট করে। ফলে পাকস্থলীর অ্যাসিড ওপর দিকে এসে খাদ্যনালিতে ঢুকে পড়ে এবং বুক জ্বলে। কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে এই সমস্যা থেকে কিছুটা রেহাই মেলে। ভাজাপোড়া ও চর্বি তেলযুক্ত খাবার এবং ক্যাফেইন যথাসম্ভব পরিহার করুন। একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে না খেয়ে সারা দিনে অল্প অল্প করে খান। খাবার পরই না শুয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করা বা সোজা হয়ে বসে বই পড়া বা টিভি দেখা উচিত। মাথার নিচে একটু উঁচু বালিশ দিয়ে শোবেন। তার পরও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

শিশুর কিডনির সমস্যা

শিশুদের সাধারণত দুই ধরণের কিডনির রোগ বেশি হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম ও অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস।

নেফ্রোটিক সিনড্রোম

লক্ষণ

সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের হয়ে থাকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। প্রথম দিকে দুই চোখের পাতা ফুলে যায় ও মুখে ফোলা ভাব দেখা যায়।পরে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে পেটে, হাতে ও পায়ে পানি জমে এবং সারা শরীর ফুলে যায়। শিশুর অণ্ডকোষেও পানি জমতে পারে। এর সঙ্গে কখনো বা প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, রং সাধারণত স্বাভাবিক থাকে। শিশুর রক্তচাপ সচরাচর স্বাভাবিক থাকে। প্রস্রাব জ্বাল দিলে প্রোটিনের পুরু স্তর পাওয়া যায়।

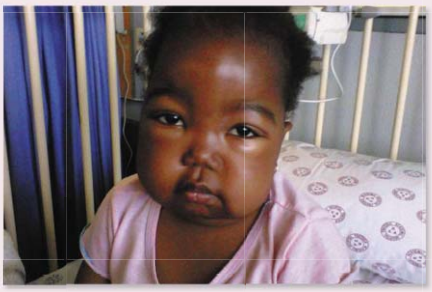

রোগ নির্ণয়

- প্রস্রাবে খুব বেশি পরিমাণে প্রোটিন বেরিয়ে যায় (৪০ মিলিগ্রাম)
- রক্তে অ্যালবুমিনের নিম্নমাত্রা, ২ গ্রামের কম
- সিরাম লিপিডে উচ্চ মাত্রা, ২২০ গ্রামের বেশি
- শিশুর সারা শরীর ফুলে যায়। প্রথমত দুটি রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয়

চিকিৎসা

- প্রথম অ্যাটাকে ও বিভিন্ন জটিলতাপূর্ণ নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করার উপদেশ দিতে হবে।
- প্রথম দু-এক সপ্তাহ শিশুর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। এতে কিডনিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। শিশু প্রোটিনসমৃদ্ধ স্বাভাবিক খাবার খাবে। তবে খাবারে অতিরিক্ত লবণ মেশানো যাবে না।
- এসাইটিস, বিভিন্ন ইনফেকশন ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিলে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট ওষুধ- শিশুদের নেফ্রোটিক সিনড্রোমে স্টেরয়েড খুব কার্যকর ওষুধ, সঠিক ডোজ ও সিডিউল মেনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা সেবন করাতে হবে।

পরামর্শ

- শিশু বয়সের নেফ্রোটিক সিনড্রোম মূলত প্রাথমিক ধরণের। ফলে বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি। ৯৩ শতাংশ শিশুর বারবার শরীর ফোলা দেখা দিলেও স্টেরয়েডের সঠিক চিকিৎসায় প্রায় সব বয়সের শিশুই সুস্থ হয়ে ওঠে।
- শিশুকে স্বাভাবিক খাবার ও খেলাধুলায় অংশ নেওয়ায় উৎসাহ দিতে হবে।
- আক্রান্ত শিশুর মা-বাবা, অভিভাবককে রোগের পুরো কার্যকারণ ও ভবিষ্যৎ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। বাড়িতে প্রস্রাব জ্বাল দিয়ে কিভাবে প্রোটিনের অস্থিত্ব পাওয়া যায় তা শিখাতে হবে।

অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস

লক্ষণ

প্রধানত স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রোগ হয়ে থাকে। শিশুর শরীরে খোসপাঁচড়া বা গলা ব্যথা অসুখের ১০ থেকে ২১ দিন পরে সাধারণভাবে এ রোগ প্রকাশ পায়। স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococcus) নামের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ এ জন্য দায়ী।

উপসর্গ

- হঠাৎ করে চোখ-মুখ, সারা শরীর ফুলে যেতে পারে।
- প্রস্রাব হয় বন্ধ কিংবা পরিমাণে খুব অল্প হতে পারে। বেশির ভাগ সময় প্রস্রাবের রং লাল থাকে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২১ দিন আগে গলা ব্যথা হয়ে থাকে। কখনো ত্বকে খোসপাঁচড়া জাতীয় চিহ্ন থাকে।
- শিশুর রক্তচাপ বেশি থাকতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

- প্রস্রাব পরীক্ষায় কিছুটা প্রোটিনের সঙ্গে লোহিত কনিকার কাস্ট পাওয়া যায়।
- কিডনির কার্যক্ষমতা বোঝার জন্য ব্লাড ইউরিয়া, সিরাম ক্রিয়েটিনিন মাত্রা দেখা হয়। সিরাম পটাশিয়ামের উচ্চমাত্রা ইসিজির সাহায্যেও বোঝা যেতে পারে।

চিকিৎসা

- প্রথম দু-এক সপ্তাহ শিশুকে বিশ্রামে রাখতে হবে। ছোটাছুটি করলে রক্তচাপ বৃদ্ধি ও হার্ট ফেইলিওর হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- শিশুর খাবারে লবণ বাদ দিতে হবে। পটাশিয়াম যুক্ত খাবার ও ওষুধ বাদ দিতে হবে। যেমন- ডাব, কলা, ফলের জুস ইত্যাদি। আমিষজাতীয় খাবার যেমন- ডিম, মাছ, মাংস সাময়িকভাবে খাওয়া বাদ দিতে হবে। তবে খাবারের মধ্যে আলু, ভাত, চিঁড়া, দুধভাত, মুড়ি, মাখন, পাউরুটি ও চিনি খেতে পারবে।

- প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কেবল ৪০০ মিলি বা সারফেস স্কয়ার মিটার বা প্রতিদিন এর সঙ্গে তার আগের দিনের প্রস্রাবের সমপরিমাণ যোগ করে মোট জলীয় পদার্থ শিশুকে পান করাতে হবে।
- শিশুকে বেনজাথিন পেনিসিলিন এক ডোজ মাংসপেশিতে (শিশুর ওজন ২৭ কেজির নিচে হলে ছয় লাখ ইউনিট এবং তার বেশি হলে ১২ লাখ ইউনিট) দিতে হবে অথবা বিকল্প হিসেবে সাত থেকে ১০ দিনের জন্য পেনিসিলিন সিরাপ বা ট্যাবলেট ছয় ঘণ্টা অন্তর খাওয়ানো, যদি দেহে পাঁচড়া বা গলা সংক্রমণের অস্তিত্ব থাকে।
- শিশুর যদি স্ক্যাবিস থাকে, তার চিকিৎসা করাতে হবে।
- উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ পটাশিয়াম মাত্রা, শ্বাসকষ্ট, চোখে ঝাপসা দেখা, মাথাব্যথা, খিঁচুনি, বমি, খুব কম প্রস্রাব - এসব জটিলতায় দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে।

পরামর্শ

- ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ অ্যাকিউট নেফ্রাইটিসের শিশু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তবে সময় নষ্ট না করে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বাচ্চার খোসপাঁচড়া বা গলাব্যথা অসুখে সময়মতো চিকিৎসা করাতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

পিত্তপাথর ও ল্যাপারোস্কপি

পিত্তপাথর অতি বড় অসুখ। এই অসুখটি প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের মাঝে দেখা যায়। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়াসহ সর্বত্র এর বিস্তার লক্ষণীয়। সর্বাধিক দেখা যায় সুইডেনে যেখানে শতকরা হার ৩৮ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়াতে শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগ পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন হার দেখা যায় আয়ারল্যান্ডে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এই রোগের হার দ্বিগুণ। যথাক্রমে শতকরা ৪৯ ভাগ থেকে ৭৩ ভাগ পর্যন্ত। আফ্রিকাতে এর হার খুবই কম যার শতকরা হার ১ ভাগেরও কম।

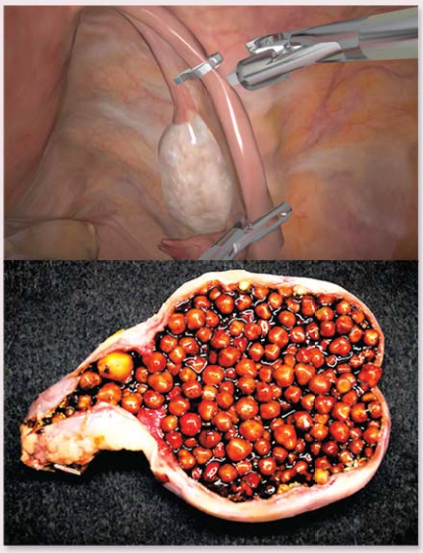

পিত্তপাথরের কারণ

পিত্তপাথরের কারণকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে

- **পুরাতন জনিত কারণ**
  - প্রদাহজনিত
  - মেটাবলিজমজনিত
  - স্থবিরতাজনিত
- **বর্তমান কারণ**
  - পিত্তরসে প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরল জমা হওয়া
  - লিভার সিরোসিস
  - সিকল সেল অ্যানিমিয়া

পিত্তপাথরের প্রকারভেদ

- **কোলেস্টরল পাথরঃ** শতকরা ৭৫ ভাগ পাথর এই শ্রেণীভুক্ত। সাধারণত সংখ্যায় অধিক। একটি মাত্র পাথর হলে তা বিরাট আকার ধারণ করে।
- **কালো রঙের পাথরঃ** এই পাথর সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ছোট আকারের হয়। সাধারণত রক্ত কনিকা ভেঙ্গে গেলে এই রঙের পাথর দেখা দেয়। এর সাথে শতকরা ২০ ভাগ ইনফেকশন থাকে।
- **বাদামী রঙের পাথরঃ** এই পাথর তৈরি হয় পিত্তনালীতে।

কখন পাথর হয়

- বয়স বাড়ার সাথে এই রোগের প্রবণতা বাড়ে।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবনে পাথরের হার বৃদ্ধি পায় কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে।

রোগের লক্ষণসমূহ

- **পেটে ব্যথাঃ** উপর পেটের মাঝখানে ও ডান পার্শ্বে ব্যথা থাকে। এই ব্যথা কখনো হালকাভাবে এবং কখনো তীব্রভাবে হয়ে থাকে। ব্যথার স্থায়ীত্ব ৩ ঘন্টা থেকে ৩ দিন পর্যন্ত থাকে। এরপর ২ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ভাল থাকে। অনেক সময় এই ব্যথা ডান পার্শ্বের ঘাড়ে চলে যায়। তীব্র ব্যথা হলে রোগী কোন অবস্থায় স্বস্তি পায় না এবং এর সাথে বমি থাকে ও জ্বর হয়। পেট ফাঁপা থাকে।
- **ক্ষুদামন্দাঃ** একবার খাওয়ার পর আর সারাদিন খেতে ইচ্ছে হবে না। মনে হবে পেট ভরা আছে। কোন কিছুতেই রুচি আসবে না।
- **জন্ডিসঃ** জন্ডিস কখনো কখনো দেখা দেয়।
- **জ্বরঃ** কখনো মারাত্বক জ্বর হয়। শরীরে ঝাকুনী দিয়ে জ্বর আসে।

জটিলতা

- পিত্তথলির পুজ যা এমপায়েমা নামে পরিচিত
- পিত্তথলি ফুটা হয়ে যাওয়া
- পিত্তথলির গ্যাংগ্রিন
- ক্যান্সার

পরীক্ষা

নানাবিধ পরীক্ষা পদ্ধতি রোগ নির্ণয় সহজ করে ফেলেছে।

- রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা
- আলট্রাসনোগ্রাফী অব হেপাটো-বিলিয়ারি সিস্টেম (USG)
- ইআরসিপি (ERCP)
- কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফি (CT)
- এম আর আই (MRI)
- কোলানজিওগ্রাফী

চিকিৎসা

চিকিৎসাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- মেডিসিন ও সার্জারী।

মেডিসিন চিকিৎসা

পিত্তপাথর রোগীরা প্রায়ই বলে থাকেন মেডিসিন দিয়ে পাথর বের করে দেন। আসলে মেডিসিনের কোন প্রকার ভূমিকা নেই পাথর সরাবার। তাই পাথর যেভাবে ধরা পড়ুক না কেন অপারেশনই একমাত্র চিকিৎসা। আর সার্জারীই একমাত্র ভরসা। এক সময় প্রচলন ছিল পাথর নির্ণয় না হওয়ার কারণে গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ সেবন করতো বছরের পর বছর। এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে, নানাবিধ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। তাই পাথর চিকিৎসা আর কোন সমস্যা নয়। বাজারে একটা ওষুধ চালু আছে যা দিয়ে পাথর গলিয়ে ফেলা যায়, তবে সেখানে যে শর্ত দেয়া হয়েছে তা ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা পূরণ কঠিন। তাই মেডিসিন চিকিৎসার প্রতি নিয়োজিত থেকে অযথা সময় ক্ষেপণ না করাই উচিত।

সার্জারী চিকিৎসা

অনেক প্রকার পদ্ধতি এখন প্রচলিত।

- পেট কাটা পদ্ধতি
- ল্যাপারোস্কপিক পদ্ধতি

যদি পিত্তথলির জটিলতা না থাকে তবে ল্যাপারোস্কপিক পদ্ধতি সেরা।

তবে সঠিকভাবে শুধু ল্যাপারোস্কপিক সার্জারী দ্বারা একমাত্র সার্জারী করা যাবে যদি রুটিনভাবে ইআরসিপি করে নেয়া যায়। এতে সময় বাঁচবে, পয়সা বাঁচবে, রোগীদের দ্বিতীয় বার অপারেশনের ঝুঁকি থাকবে না। উন্নত বিশ্বের সব দেশে এই প্রথা চালু হয়েছে। ইআরসিপির একটি ভালো দিক হচ্ছে, শুরুতেই পেরিএমপুলারী ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মূত্রথলির প্রদাহ

মূত্রথলির প্রদাহকে চিকিৎসা পরিভাষায় সিস্টাইটিস বলে। যদিও মহিলাদের এই রোগ সচরাচর বেশি হয়, তবে পুরুষরাও এতে আক্রান্ত হন এবং সববয়সী পুরুষরাই আক্রান্ত হন।

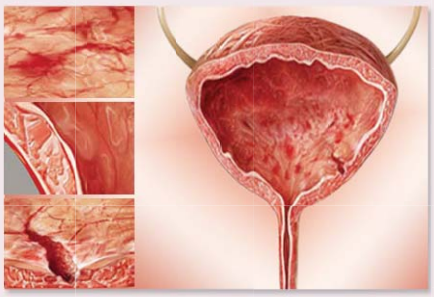

মূত্রথলির প্রদাহের ধরণ

সিস্টাইটিস বা মূত্রথলির প্রদাহের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে, যেমন-

- ব্যাকটেরিয়াজনিত মূত্রথলির প্রদাহঃ এটি সবচেয়ে সাধারণ ধরণ। পায়খানার রাস্তা থেকে ব্যাকটেরিয়া এসে মূত্রনালি দিয়ে মূত্রথলিতে প্রবেশ করে এবং সংক্রমণ ঘটায়।
- ইন্টারসটিশিয়াল মূত্রথলির প্রদাহঃ সাধারণত মূত্রথলিতে আঘাতের কারণে এটি হয় এবং এক্ষেত্রে সংক্রমণের উপস্থিতি খুব কম হয়। এ ধরণের রোগীদের রোগ নির্ণয়ে সচরাচর অনেকেই ভুল করেন। এ রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় না। রোগের কারণ অজানা। বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা রয়েছে।
- ইয়োসিনোফিলিক মূত্রথলির প্রদাহঃ এটি মূত্রথলির প্রদাহের একটি বিরল ধরণ। বায়োপসির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। এসব ক্ষেত্রে মূত্রথলির দেয়াল অসংখ্য ইয়োসিনোফিলে পূর্ণ থাকে। যদিও এ ধরণের রোগের সঠিক কারণ জানা যায়নি, তবে শিশুদের ক্ষেত্রে কিছু ওষুধ এ রোগ বাড়িয়ে দেয়।
- রেডিয়েশন মূত্রথলির প্রদাহঃ যেসব রোগী ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য রেডিয়েশন নিচ্ছেন, তাদের সচরাচর এ সমস্যা দেখা দেয়।
- হেমোরেজিক মূত্রথলির প্রদাহঃ এ ধরনের মূত্রথলির প্রদাহে প্রস্রাবের সাথে রক্ত পড়ে।

রোগের কারণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো

স্বাভাবিক জীবাণুমুক্ত নিম্ন মূত্রপথ (মূত্রনালি ও মূত্রথলি) ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে মূত্রথলির প্রদাহ হয়। এক্ষেত্রে নিম্ন মূত্রপথ জ্বালা করে ও প্রদাহ হয়। এটা খুবই সাধারণ। বয়স্ক লোকদের মূত্রথলির প্রদাহে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশি ক্ষেত্রে মূত্রথলির প্রদাহে কারণ হলো- ই. কলাই *(E.Coli)* নামক ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলী-অন্ত্র পথের নিচের অংশে দেখা যায়। যৌনসঙ্গম মূত্রথলির প্রদাহে ঝুঁকি বাড়াতে পারে, কারণ যৌনসঙ্গমের সময় ব্যাকটেরিয়া মূত্রনালি দিয়ে

মূত্রথলিতে ঢুকতে পারে। একবার ব্যাকটেরিয়া মূত্রথলিতে ঢুকলে সাধারণত প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই যদি ব্যাকটেরিয়া বংশবিস্তার শুরু করে তাহলে মূত্রথলিতে সংক্রমণ ঘটে। মূত্রথলির প্রদাহের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মূত্রথলি অথবা মূত্রনালিতে প্রতিবন্ধকতা, মূত্রপথে কোনো যন্ত্রপ্রয়োগ (যেমন ক্যাথেটার বা সিস্টোস্কপ), ডায়াবেটিস, এইচআইভি এবং ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার কারণে কিডনির ক্ষতি ইত্যাদি। বয়স্ক লোকদের মূত্রথলির প্রদাহের ঝুঁকি বেশি থাকে কারণ কিছু অবস্থা যেমন প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ এবং মূত্রনালির সংকীর্ণতার জন্য মূত্রথলি সম্পূর্ণ খালি হতে পারে না; এর ফলে মূত্রথলিতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। আরো কিছু অবস্থা মূত্রথলির প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ায়, যেমন-

- পর্যাপ্ত তরল না খাওয়া।
- যত্রতত্র পায়খানা করে ফেলা অর্থাৎ পায়খানা ধরে রাখতে না পারা।
- হাঁটা চলা কম করা অথবা না করা।
- দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকা।

লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ

- তলপেটে চাপ বা ব্যাথা অনুভব করা।
- প্রস্রাব করার সময় ব্যথা বা কষ্ট হওয়া।
- ঘনঘন প্রস্রাব করা অথবা প্রস্রাবের তীব্র ইচ্ছা জাগা।
- রাতের বেলা প্রস্রাবের ইচ্ছা জাগা।
- প্রস্রাব ঘোলাটে হওয়া।
- প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া।
- প্রস্রাবে দুর্গন্ধ হওয়া।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

- প্রস্রাবের শ্বেত রক্ত কণিকা অথবা লোহিত কণিকা যাচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য প্রস্রাব বিশ্লেষণ।
- ব্যাকটেরিয়ার ধরণ নিরূপন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষা।

- তলপেটের এক্স-রে।
- তলপেটের আলট্রাসনোগ্রাফি।

চিকিৎসা

যেহেতু ইনফেকশন কিডনিতে ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে এবং বয়স্ক লোকদের জটিলতা হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি থাকে, তাই সর্বদা দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে। ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ যেসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় সেসব হলো-

- নাইট্রোফুরানটয়েন
- ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজল
- অ্যামোক্সিসিলিন
- সেফালোসপরিন
- সিপ্রোফ্লোক্সাসিন অথবা লিভোফ্লোক্সাসিন
- ডক্সিসাইক্লিন
- সিপ্রোফ্লোক্সাসিন

প্রস্রাবের কালচারের ফলাফল দেখে অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচন করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী অথবা বারবার মূত্রপথের সংক্রমণের ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে হবে নইলে কিডনিতে সংক্রমণ হওয়ার আশংকা থাকে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। তীব্র উপসর্গ চলে যাওয়ার পর কখনো কখনো স্বল্পমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক প্রদান করা হয়। মূত্রথলির প্রদাহের রোগীর প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও প্রস্রাবের তীব্র ইচ্ছে থাকলে পাইরিডিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রস্রাবে ব্যাকটেরিয়ার ঘনত্ব কমানোর জন্য প্রস্রাবে অম্লের পরিমাণ বাড়ায় এমন অ্যাসকরবিক অ্যাসিড অথবা ক্র্যানবেরি জুস খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া একটা পুরানো পন্থা যেমন লবণ-পানির ডুশ বেশ কার্যকর। কুসুম গরম পানিতে প্রচুর লবণ মিশিয়ে গোসল করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসা শেষে কিংবা চিকিৎসার মধ্যে মূত্রথলিতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি আছে কিনা তা জানার জন্য পুনরায় চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবারো প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূত্রথলির প্রদাহ অস্বস্তিকর, তবে চিকিৎসার পর কোনো ধরণের জটিলতা সৃষ্টি না করেই সেরে যেতে পারে।

সম্ভাব্য জটিলতা

- দীর্ঘস্থায়ী কিংবা বরবার মূত্রপথে সংক্রমণ।
- জটিল মূত্রপথের সংক্রমণ বা পাইলো নেফ্রাইটিস।
- কিডনির কার্যকারিতা তীব্রভাবে লোপ পাওয়া।

প্রতিরোধ

- যৌনাঙ্গ সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। মলত্যাগের পর পায়ুপথ ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এতে পায়ুপথ থেকে মূত্রনালিতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের সম্ভাবনা কমবে।
- প্রচুর তরল পান করতে হবে যাতে ঘন ঘন প্রস্রাবে ব্যাকটেরিয়া প্রস্রাবের থলি থেকে বের হয়ে যেতে পারে। যৌন সঙ্গমের পরপরই প্রস্রাব করতে হবে, এতে যৌন সঙ্গমকালে জড়ানো যেকোনো ব্যাকটোরিয়া বংশবিস্তার করতে পারে না, তাই ঘন ঘন প্রস্রাব করলে মূত্রথলির প্রদাহের ঝুঁকি কম থাকে।
- ক্যানবেরি জুস পান করলে কিছু নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। মূত্রথলির প্রদাহের রোগ করতে ক্র্যানবেরি নির্যাস দিয়ে তৈরি ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

অ্যালঝেইমার্সের লক্ষণ

ভুলে যাওয়া

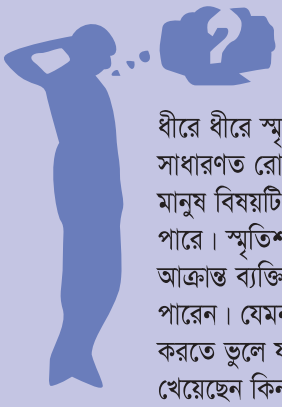

ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে। সাধারণত রোগীর আশেপাশে থাকা মানুষ বিষয়টি প্রথমে লক্ষ্য করতে পারে। স্মৃতিশক্তি বেশি কমলে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারেন। যেমন- দৈনন্দিন কাজ করতে ভুলে যাওয়া, সকালে নাস্তা খেয়েছেন কিনা ভুলে যাওয়া, যথা সময়ে ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া ইত্যাদি।

সহজ কাজ করতে না পারা

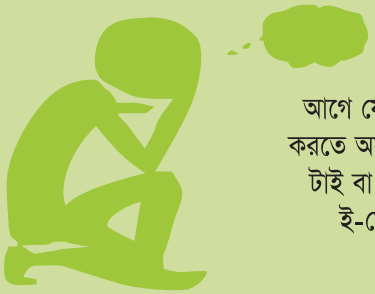

আগে যে কাজটি করতে কোনই অসুবিধা ছিল না, তা করতে অসুবিধা বোধ করা বা করতে না পারা। যেমন- টাই বা জুতার ফিতা বাঁধতে না পারা, কম্পিউটার বা ই-মেইল পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া, শার্টের বোতাম লাগাতে না পারা ইত্যাদি।

স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি

কয়টা বাজে, কোথায় আছেন, কেন এখানে এসেছেন ইত্যাদি বিষয়ে রোগী বিভ্রান্তে পরে। একটি অনুষ্ঠানে তিনি যান, কিন্তু যাওয়ার পরে মনে করতে পারেন না কেন এসেছেন বা কোথায় এসেছেন।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন

কোন কারণ ছাড়াই বিষন্নতা, বিভ্রান্তি, ভয় এবং উদ্বিগ্নতায় ভোগেন।

অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন না।

সমস্যা সমাধানে অপারগতা

দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাটো সমস্যা সমাধান করতে প্রায়ই ব্যর্থ হন। সহজ কোন কাজও কোন জটিলতা তৈরি ছাড়া করতে পারেন না।

ছবি ও আয়নায় বিভ্রান্তি

আয়নায় ছবি দেখে বিভ্রান্তি হন। নিজেকে চিনতে ও অনেক সময় অসুবিধা বোধ করেন। হঠাৎ কোন ফাঁকা ঘরে গেলে তিনি বুঝতে পারেন না কোন পথ দিয়ে বের হবেন।

কথা বলতে অসুবিধা বোধ

অনেকেই কথা বলতে বলতে কি বিষয়ে কথা বলছেন তা ভুলে যান। কথা বলার সময় শব্দ হারিয়ে ফেলেন। অনেক শব্দ বহু চেষ্টা করেও মনে করতে ব্যর্থ হন।

বিচার করার ক্ষমতা

কখন কি করতে হবে, তা ঠিক করতে পারেন না। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, তা বের করতে অসুবিধা বোধ করেন।

অনেক সময় বিনা কারণে অন্যকে বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়ে দেন, অনেক সময় খুব সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়েন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অনীহা

পারিবারিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলেন।

সামাজিক মেলামেশার প্রতি আকর্ষণ হারান। আড্ডা, অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলেন। নিজেকে আলাদা রাখতে চান।

অগোছালো

জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখেন, কোথায় কোনটা রাখতে হবে তা বুঝতে পারেন না।

অনেক সময় অন্যের জিনিস নিজের মনে করে নিয়ে ফেলেন।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

এসিআই লিমিটেড